সংবাদ

তারিখ 15 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

শাহ্ আলম বাদশা

নিরক্ষরতা একটি সামাজিক অভিশাপ। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী কখনোই আধুনিকতা ও উন্নত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত; পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত আছে, যে শিক্ষিত আর যে অশিক্ষিত– তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে? হযরত মুহাম্মদ (সা.) একেকজন মুসলমানকে নিরক্ষরতামুক্ত করার শর্তেই প্রতিটি অমুসলিম যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দিতেন। এ থেকেও সাক্ষরতা বা শিক্ষার মর্যাদা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমানে বিশ্বের দেশে দেশে এমনকি জাতিসংঘ সনদের শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদান করা হয়েছে।

নবগঠিত বাংলাদেশে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২৪%। ফলে তখন বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের পাশাপাশি যথাযথ জাতীয় উন্নয়ন যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি আর্থ-সামাজিকভাবেও যথেষ্ট পিছিয়েছিল দেশ। এমন পরিস্থিতিতে সরকার ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি গণশিক্ষা কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নিরক্ষরতামুক্ত দেশগড়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করে। এরই অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় চালু করা হয় 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প।' প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষাকার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির হারবৃদ্ধি, প্রাক প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়ারোধ এবং শিশুদের ভবিষ্যৎ গুণগতমান অর্জনের ভিত্তি রচনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এ প্রকল্পের অধীনে প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৭৫ হাজার শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। কিন্তু জনচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসময় অতিরিক্ত আরও ২০ হাজারসহ ৯৫ হাজার শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করে তোলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬ লাখ ১২ হাজার জনকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও অতিরিক্ত আরও প্রায় ১ লাখ ১২ হাজারসহ মোট ৭ লাখ ২৪ হাজার জনকে শিক্ষাদান করা হয়। প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সফলতার সঙ্গে সুসম্পন্ন হওয়ায় দেশে-বিদেশে তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। কারণ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অবকাঠামো নির্মাণসহ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সংক্রান্ত কোন ঝামেলা যেমন নেই যেহেতু মসজিদদের ইমামরাই নামমাত্র সম্মানির বিনিময়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে বসেই শিক্ষকতার কাজটি করে থাকেন। তেমনি এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ঝরেপড়া বা ড্রপ আউট একদম নেই বললেই চলে। অর্থাৎ প্রকল্পের শতভাগ সাফল্যের কারণেই পরে তৃতীয়পর্যায়ে সম্প্রসারিত আকারে একে ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল মেয়াদে অনুমোদন করা হয়। এ পর্যায়ে সারাদেশে ১২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১৬ লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রেও অতিরিক্ত প্রায় সাড়ে ৯ হাজারসহ ১৬ লাখ ৪৩ হাজার জনকে শিক্ষাদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ধারাবাহিকভাবে চলমান এ প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ সাল মেয়াদে প্রকল্পটির চতুর্থ পর্যায়ের কার্যক্রম চলছে। চতুর্থ পর্যায়ে সর্বমোট ১৬ লাখ ৭৭ হাজার ৬০০ জনকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রাক প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার পাশাপাশি কোর্স সমাপ্তকারীদের পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান করা হচ্ছে। বর্তমানে মোট ৪৭৯টি উপজেলায় ১৮ হাজার প্রাক প্রাথমিক ৭৬৮টি বয়স্ক এবং ১২ হাজার কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সময়ে শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে মোট ১২ লাখ ৬০ হাজার জন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানকে ধরে রাখার স্বার্থে সারাদেশে ৪৭৯টি মডেল রিসোর্স সেন্টার ও ৯৯৫টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব রিসোর্স সেন্টার পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের সাব অফিস হিসেবেও ভূমিকা পালন করছে। ফলে নব্য সাক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত ও সাধারণ গ্রামীণ পাঠকরা তাদের আয়বর্ধক, দারিদ্র্য দূরীকরণ সহায়ক, সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও শিষ্টাচারমণ্ডিত জীবনগড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

বলা বাহুল্য যে, সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ফলে একদিকে যেমন বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়েছে তেমনি গণশিক্ষার আওতায় নিরক্ষরতামুক্ত দেশগড়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

[পিআইডি ফিচার]